



⊙ রাজনৈতিক দল ⊙ নির্বাচন কমিশন

Syllabus on Bangladesh Affairs

❖ **Political Parties** : Historical Development; Leadership; Social Bases; Structure; Ideology and Programmes; Factionalism; Politics of Alliances; Inter and Intra-Party Relations; Electoral Behaviour; Parties in Government and Opposition.

❖ **Elections in Bangladesh**: Management of Electoral Politics : Role of the Election Commission; Electoral Law; Campaigns; Representation of People's Order (RPO); Election observation Teams.

BCS প্রশ্নাবলী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন

- ⇒ নেতৃত্ব কী? (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে জোট গঠন নতুন কোন ঘটনা নয়- আলোচনা। (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রসারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ দুর্নীতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসকরণ একটি মহৌষধ- মতামত দিন। (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও উহার কার্যাবলী আলোচনা করিয়া উহাতে কোনো পরিবর্তন সুপারিশ করেন কি? (৩২তম বিসিএস)
- ⇒ জরুরি অবস্থা কি প্রেক্ষাপটে জারি করা যায়? জরুরি অবস্থা জারি সংক্রান্ত সংবিধানে বিধৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি আলোচনা করুন। (৩০তম বিসিএস)



যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. ১৯৯১ সাল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সাফল্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
৩. 'জাতীয় সংসদ হওয়া উচিত সবকিছুর প্রাণ কেন্দ্র' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৪. 'রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়েই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ' বিশ্লেষণ করুন।
৫. 'নেতৃত্ব' বলতে কী বোঝায়? নেতৃত্বের ধরনসমূহ উল্লেখপূর্বক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলিসমূহ আলোচনা করুন।
৬. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি তুলে ধরুন।
৭. নির্বাচনের সময় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা/গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।
৮. বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা আলোচনা করুন।
৯. স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক?
১০. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) বলতে কী বোঝায়?



আলোচ্য বিষয়

- ▶ রাজনৈতিক দল
- ▶ নির্বাচন কমিশন

STUDENT



STUDY

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নবীন গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা লক্ষণীয়। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল ঘটে যদিও ২০০১ সালের নির্বাচনে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। চারদলীয় জোট হলেও মূলত সরকারের মূল শক্তি ও নীতি নির্ধারক বিএনপি। তেমনি ২০০৮ সালেও ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলেও এই দলটিই রাজনীতির মাঠে প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে দুটি প্রধান দলই ক্ষমতায় এসেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তৃতীয় কোনো দলের একার পক্ষে সরকার গঠন সম্ভবপর মনে হয় না। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে রাজনীতি ও ক্ষমতা দুটি দলকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

▶ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতো বাংলাদেশের জনগণও প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নির্বাচন কার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই 'দলীয় সরকার' বলা হয়। এজন্য এর ভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচিত হওয়ার আগে ও পরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে-

১. **রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ :** আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং এগুলোর জনসংখ্যাও বিপুল। অধিকাংশ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় এবং এগুলোর মধ্যে কোন সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করে।
২. **নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন :** রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, "জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণ রায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য।" রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিজ দলের কর্মসূচির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে।
৩. **জনমত গঠন :** দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সপক্ষে জনমত গঠন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও ফলা প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি এবং প্রচলিত জনমতকে প্রভাবিত করে।
৪. **প্রার্থী মনোনয়ন :** নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে।
৫. **প্রচারণা :** রাজনৈতিক দল নিজ দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায়। এর ফলে নির্বাচকমন্ডলী দেশের জন্য কোন দলের কর্মসূচি বা নীতি উপযোগী এবং কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া উচিত তা সহজেই এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
৬. **ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ :** রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে ভোটদাতাদের তালিকায় কোন নির্বাচক বা ভোটারের নাম ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ল কি না, ভোটের সময় ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কি না, ভোট গণনায় কোন অন্যায় বা কারচুপি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।
৭. **সরকার গঠন :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।
৮. **বিরোধী ভূমিকা পালন :** সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণ-বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। এর ফলে বিরোধী দলগুলো জনগণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দলও জনকল্যাণের কাজে উদ্যোগী হয়।

৯. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার : রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালায়। এর ফলে জনগণের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা দূর হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে।
১০. স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ : রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুল ধরে। এর ফলে কোন দলই। গণবিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।
১১. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ : রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে বাই অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।
১২. শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন : জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরাজিত হতে বাধ্য। সরকার পরিবর্তনের জন্য কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না। শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনে রাজনৈতিক দল সহায়তা করে।
১৩. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন : সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এজন্য মন্ত্রিপরিষদকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারেও রাজনৈতিক দল শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
১৪. জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি : রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থ বা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৯১ সাল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশে পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ঘুরে ফিরে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছেই ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। একদল এখন ক্ষমতাসীন তো অন্যদল বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত। আবার অন্য দলটি ক্ষমতাসীন তো প্রথম দলটি বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের যে ধরনের ভূমিকা থাকার কথা রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এবং সংসদের বাইরে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণকে অনেকটাই হতাশ। করেছে। জাতীয় সংসদ ছিল অনেক সময় বিরোধী দল শূন্য এবং অকার্যকর। বিরোধীদলগুলো ছিল শুধু নামমাত্র এবং সংসদ অধিবেশন বর্জন ছিল নিয়মিত ব্যাপার। সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলো যেমন বারবার ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ক্ষমতাসীন সরকারি দলগুলোও ব্যর্থ হয়েছে বিরোধী দলগুলোকে সংসদে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে।

১৯৯১ সালের পরে বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো

১. সংসদ বর্জন : ১৯৯১ সালে ক্ষমতাসীন ছিল বিএনপি এবং বিরোধী দল ছিল আওয়ামী লীগ। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদের মোট ৪০০ কার্যদিবসের মধ্যে আওয়ামী লীগ উপস্থিত ছিল মাত্র ১৩৫ দিন। তার পরের সংসদে অর্থাৎ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল বিএনপি। অথচ বিএনপিও পূর্বের বিরোধী দলের মতো মোট ৩৮২ কার্য দিবসের মধ্যে সংসদে উপস্থিত ছিল ১৬৩ দিন। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরের সংসদে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সংসদে উপস্থিত ছিল মোট ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ১৫০ দিন। এর পরে নবম সংসদ ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পূর্বের সংসদগুলোর সব রেকর্ডকে অতিক্রম করে। ঐ সংসদে বিরোধী দল বিএনপি মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে কেবল ৭৬ দিন উপস্থিত ছিল। বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া উপস্থিত ছিলেন কেবল ১০ দিন। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের পর সবচেয়ে কম উপস্থিতি।
২. বিরোধিতার জন্য সমালোচনা : সংসদ কার্যকর হয় বিরোধী দলের উপস্থিতি ও গঠনমূলক আলোচনায়। সরকারের প্রশংসনীয় কাজে বিরোধী দল একাত্মতা ঘোষণা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারকে উৎসাহ যোগাবে এবং নিন্দনীয় কাজে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করবে। এতে দেশ ও জনগণের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। এখানে যে দল যখনই বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তখনই তারা সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু সমালোচনাই করেছে। ক্ষমতাসীন দলের শুধু বিরোধিতা করাই যেন তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়।
৩. দেশের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ : বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সরকারের সমালোচনা করা হলেও দেশের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অধিকাংশ সময়ই তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সরকারের বিরোধিতার মুখ্য বিষয় ছিল ব্যক্তিগত কারণ কিংবা দলীয় কারণ। জনস্বার্থ বিষয় নিয়ে এখন পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো তেমন সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

৪. একই দলের বারবার বিরোধী দল হওয়া : ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কোন দল টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসেনি। এ সময়ের মধ্যে ষষ্ঠ সংসদ (যার মেয়াদ ৩০ দিনের কম) ছাড়া আওয়ামীলীগ দুবার ও বিএনপি দুবার ক্ষমতায় এসেছে। দেখা যায়, এ দু দলই বারবার ক্ষমতাসীন এবং সংসদের বিরোধী দল ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো দলের প্রতি দেশের জনগণ আস্থা না রাখতে পারার কারণেই বার বার ক্ষমতার এই পালাবদল ঘটেছে।

বিরোধী দলের উপর সরকারের দমন পীড়ন : বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের পর থেকে সরকারি দল কর্তৃক বিরোধী দলের উপর দমন পীড়নের হার বেড়ে গিয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যেন একে অপরের জাত শত্রু। যে দলই ক্ষমতায় গিয়েছে সে দল-ই বিরোধী দলের সদস্য-সমর্থকদের উপর দমন নিপীড়ন চালিয়েছে। পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে হাজার হাজার মামলা দিয়ে বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে রাখার মতো ঘটনা সংসদের প্রতি মেয়াদেই ঘটেছে। এমনকি মানব বন্ধন, সংবাদ সম্মেলন, মিছিল মিটিং পর্যন্ত করতে বাধা দেয়া হয়।

৬. বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি : বাংলাদেশে যে দলই বিরোধী দল হিসেবে থাকুক না কেন সে দলই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করেছে। কোনো কিছু ঘটলে কিংবা দলীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বিরোধী দল হরতাল আহবান করে দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায়। গাড়ি ভাংচুর, গাড়িতে অগ্নি সংযোগ, অবরোধ প্রভৃতি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে, তেমনি অনেক হতাহতের মতো ঘটনাও দেশকে পঙ্গু করে দেয় ১৯৯১ সালে। সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় চালু হলেও বিরোধী দলগুলো এখনো ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা যতটা না ইতিবাচক তার চেয়ে বেশি নেতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলগুলো থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পাওয়ার আশা থাকলেও কার্যত সংসদ ও সংসদের বাইরে বিরোধী দলগুলো তেমন সক্রিয় ভূমিকা দেখাতে পারেনি। বরং দিন দিন ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। দেশের স্বার্থে এমন বৈরী অবস্থার অবসান এখন থেকেই দরকার।

STUDENT



STUDY

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সাফল্য ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা

গণতন্ত্র

Democracy শব্দটি ২টি গ্রীক শব্দ demos (People) এবং kratos (rule) থেকে এসেছে। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এর মতে, “ইহা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণী সমূহের ওপর ন্যস্ত থাকে না বরং সমাজের সদস্যগণের ওপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে।” C. F. Strong বলেন, “Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed” (শাসিত গণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা যায়)

গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা গঠিত একটি সরকার ব্যবস্থা, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের উপর, যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনগণের প্রতিনিধিরা যারা নির্বাচিত হন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের (Democracy is a government of the people, by the people and for the people) মর্মবাণীই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল এবং একমাত্র উপজীব্য বিষয়। মূলতঃ গণতন্ত্র হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের। ভিত্তিতে গঠিত সরকারব্যবস্থা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, মত ও চিন্তার উদারনৈতিক স্বাধীনতা, নির্বাচনে শাসক দল পরাজিত হলে বিজয়ী দলের হাতে দ্বিধাহীন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, সংখ্যালঘিষ্ঠের সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তৃত্বের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সুতরাং, গণতন্ত্র হচ্ছে। জনগণের দ্বারা গঠিত একটি সরকারব্যবস্থা, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের ওপর, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনগণের প্রতিনিধিরা, যারা নির্বাচিত হন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়

বাংলাদেশ সহ যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সরকারী ও বিরোধীদলের সমগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলসমূহের সময়োচিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। রাজনৈতিক দল বলতে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সব দলকেই বোঝানো হয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সরকারী দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো-

ক. সরকারী দলের করণীয় : সরকারী দল গণতন্ত্রের সফলতার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে-

০১. নাগরিক অধিকার সমমান্ত রাখা : সরকার নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিত করবে। কোন অবস্থাতেই জনগণের নাগরিক অধিকার হরণ করা বা বিঘ্নিত করা যাবে না। নাগরিক অধিকার নাগরিককে দেশ তথা সরকারের প্রতি অনুগত ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে এবং গণতান্ত্রিক আচরণের অভ্যস্ত করে তুলে। অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের কাছে সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রত্যাশা বাতুলতা।
০২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : সরকারের পবিত্রতম দায়িত্ব হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এর অর্থ দাড়ায় সরকার পরিচালিত হবে দেশের সংবিধান অনুযায়ী। মনগড়া কোন বিধান, কোন প্রকার অনুরাগ বা বিরাগ জনিত কোন নীতি, বিশেষ মতবাদ, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি নয়- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলকথা হল ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন। বাংলাদেশসহ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে আইনের শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষ্যনীয় এবং এ সকল অঞ্চলে গণতন্ত্র ভঙ্গুর ও দুর্বল।
০৩. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন : সরকার নির্বিশেষে সকল জনগণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। সেলক্ষ্যে সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এর বড় অভাব লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিটি সরকার এক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে। এখানে প্রকল্প জনকল্যাণমুখী না হয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়ে থাকে।
০৪. দেশের জনগণকে সকল দুর্যোগ থেকে মুক্ত রাখা : জনগণের জান মালের হেফাজত সরকারের দায়িত্ব। এছাড়া কোন দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। সকল ক্ষেত্রে সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অথবা মনুষ্য সৃষ্ট কোন প্রতিকূল অবস্থায় সরকার জনগণের পাশে থাকবে।
০৫. দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে দেশ পরিচালনা : দুর্নীতি বাংলাদেশের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্র এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে এর থেকে মুক্ত হওয়া যে কোন সরকারের পক্ষেই দুরূহ বিষয়। দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নে এর দুর্নীতি দমনের কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্রে দেশের পরিচালনায় দায়িত্ব যেহেতু জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত সরকারের। সেহেতু সরকার যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলো দলীয় করণ ও দুর্নীতির মাধ্যমে ধ্বংস করে ফেলে।
০৬. সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা : বাংলাদেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সংসদ বর্জন একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। সরকারে তরফে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য, কাদাছুড়াছুড়ি প্রভৃতি কারণে বিরোধীদল সংসদে থাকছে না। বিরোধী দলহীন নিপ্রাণ সংসদে সরকার তার ইচ্ছা মাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।
০৭. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন : গণতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে সকল কু-প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যাতে করে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকে, বিশ্বাসযোগ্য ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান, গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক সংলাপের ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব।
০৮. নমনীয়তা : সরকারী দলকে মনে রাখতে হবে, শুধু তাদের নিয়েই নয় বরং তাদের ও বিরোধীদল উভয়কে নিয়েই রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার। সুতরাং সরকারী দলকে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, হতে হবে অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে জনগণের কাছে। আর তাই সরকারী দলকে অনেক বেশী নমনীয় হতে হবে।
০৯. দমননীতি পরিহার করা : বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায়, নির্বাচনোত্তর সরকারী দল বিরোধী দলের উপর অন্যায়ভাবে অহেতুক দমননীতি প্রয়োগ করে। থাকে, যা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে যেমন সরকারী দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় তেমনি গণতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংঘাত ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।
১০. একচেটিয়াত্ব বর্জন করা : বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায়, নির্বাচনে জয়লাভকারী দল সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়ম করতে সচেষ্ট হয় যা গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারী দল গণতন্ত্র হতে বহু দূরে সরে যায়।

খ. বিরোধী দলের করণীয় : বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিরোধী দলসমূহকে নিম্নোক্ত দায়িত্বশীল বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে-

০১. গঠনমূলক সমালোচনা : গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার বলা হয়। এ দলের প্রধান কাজ সরকারী দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা।
০২. বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয় : বিরোধী দল বলেই বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। ফলে সরকারী দল বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়ন করতে ও উৎসাহিত হবে এবং এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।
০৩. সংসদ বর্জনের সাংস্কৃতি পরিহার : বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরোধীদল বরাবরই সংসদে অনুপস্থিত থাকছেন। তাদের মত প্রকাশের সুযোগ না দেওয়া, সরকার দলের সংসদ সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন বিরূপ ও অশালীন বক্তব্য- নানা কারণে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে আসছে। এর ফলে তারা তাদের নির্বাচনী এলাকা তথা নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দেশের জন্য সংসদে কথা বলতে পারছেন না। জনগণ অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে।
০৪. জনমত সৃষ্টি : বিরোধীদলের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হিসেবে অপরাপর রাজনৈতিক দলও সরকারের কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পলিছি, মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরবে এবং আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রভৃতি বিষয়ে তারা অবদান রেখে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখবে ও জনমত সৃষ্টি করবে।
০৫. মুক্তিগ্রাহ্য দায়িত্বশীল যুক্তিতর্ক : দলীয় নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক পরিপক্বতা আনয়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরোধীদল “জাতীয় সংলাপ” পরিচালনা করবে যা রাজনীতিকে উন্নততর উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে।
০৬. সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা : গণতন্ত্রের প্রাণ হল জনগণ। বিরোধী দল সবসময় সাধারণ জনগণ ও ভোটারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
০৭. পর্যবেক্ষণ : বিরোধীদল সরকারের সকল বিষয়ের পর্যবেক্ষণ করবে এবং জনগণের কাছে তার ভুল-ত্রুটি ও সমালোচনা তুলে ধরবে।
০৮. বিকল্প উপস্থাপন : বিরোধীদল সকল বিষয়ে সুবিধা জনক সম্ভব্য বিকল্প জনগণের নিকট উপস্থাপন করবে। তারা নির্বাচিত হলে জনগণের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপের কি কি বিকল্প ধারণা, নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করবে তা প্রচার করবে।
০৯. ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের ভূমিকা : বিরোধীদল ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করবে। নেতৃত্ব গঠনের জন্য ছায়ামন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। এতে দেশ দক্ষ নেতৃত্ব পাবে, গণতন্ত্র আরো মজবুত হবে।
১০. রাজনৈতিক সংস্কৃতি শক্তিশালীকরণ : এ উদ্দেশ্যে বিরোধীদল দলের ভেতরে ও বাইরে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতির পূর্ণ চর্চা করবে। এ উদ্দেশ্যে বিরোধী দল উন্মুক্ত আলোচনা, দলের অর্থনৈতিক হিসাবের সচ্ছতা আনয়ন, সভা-সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন করবে।
১১. যোগাযোগ : বিরোধীদল নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, সামাজিক সংগঠন যারা ভোটার তালিকা প্রণয়ন নাগরিক শিক্ষা ও নির্বাচনের সচ্ছতা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে।
১২. গবেষণা : বিরোধীদল গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবৈতনিক প্রধান গবেষক (Unpaid Principal Researcher)-এর ভূমিকা পালন করবেন। তারা সরকারের ত্রুটি ও জনগণের জন্য তাদের করণীয় বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করবে।

গ. অন্যান্য বিষয়সমূহ যাতে রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন : সরকারী এবং বিরোধী দলকে সকল বিতর্কে উর্ধ্বে উঠে জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে বেশ কিছু গুণাবলীর চর্চা করতে হবে। আর এ সকল বিষয়ের উপর যথাযথ দক্ষতা অর্জনই পারে রাজনৈতিক দলসমূহকে জনগণের প্রতি প্রদত্ত আশ্বাসের বাস্তব। প্রতিফলন নিশ্চিত করতে। নিম্নে এ সকল বিষয়সমূহ আলোচিত হল-

১. পরমসহিষ্ণুতা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক হওয়ায় এখানে পরমতসহিষ্ণুতা ও যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার সফলতা ও বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা। তাই বাংলাদেশের সরকারী এবং বিরোধী দলসমূহকে আরো অধিকমাত্রায় পারস্পরিক মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে।
২. ঐকমত্য অর্জন : বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধীতা সহ্য করার মতো ধৈর্য্য ও পরিপক্বতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারী দল বিরোধী দলের মতামতের তোয়াক্ক না করে একতরফাভাবে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে বিরোধী দল শুধু বিরোধীতা করার স্বার্থে সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো থেকে বিরত থাকে। তাই উভয়কেই আরো সহনশীল হতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। তবেই সত্যিকারের গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া যাবে।
৩. সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা : সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বসেই সরকারী এবং বিরোধী দলের সকল বিরোধ-বিতর্কে অবসান ঘটতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে জাতীয় সংসদ। সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে বিরোধী দলের কোন যৌক্তিক দাবী অগ্রাহ্য করা যাবে না বরং বিরোধী দলকে জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৪. আপোষকামী মনোভাব : গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলকে আপোষকামী মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে।
৫. কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করা : সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দলসমূহকে পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে গঠনমূলক সমালোচনার আশ্রয় নিতে হবে।

STUDENT



STUDY

জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিতে বিরোধীদল

জনগণের নির্বাচিত জাতীয় সংসদের কাছে নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সামষ্টিকভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থার একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। এজন্য সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত দেশসমূহে আইনসভাকে সকল আলোচনার কেন্দ্রে দেখা যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও জাতীয় সংসদ কখনও আলোচনার কেন্দ্র হতে পারে নি।

✚ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বাস্তব অবস্থা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রধান বৈশিষ্ট্য করে সংবিধান প্রণীত হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বাতিলের পর দ্বাদশ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। তবুও বিভিন্ন কারণে অতীত ও বর্তমান সকল সময়ই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার তথা সকল প্রত্যাশার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হতে ব্যর্থ হয় এবং হচ্ছে। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হলো-

- অধিকাংশ অধিবেশন বিরোধী দলহীন অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়।
- সংসদীয় কমিটিগুলির তেমন কার্যকারিতা নেই।
- সরকার ও বিরোধীদল উভয়েই অসহিষ্ণু আচরণ করে।
- বিরোধী দলের সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকারের বিরোধিতা করতে দেখা যায় না।
- সংসদে অশ্রাব্য ভাষা, কুৎসা ও প্রতিহিংসামূলক বিতর্ক দেখা যায়।
- সরকারকে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংসদকে পাশ কাটিয়ে প্রায়শই আইন প্রণয়ন করতে দেখা যায়।
- সংসদ সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণের অনীহা লক্ষণীয়।

✚ সংসদ হওয়া উচিত সবকিছুর প্রাণ কেন্দ্র

সংসদ কার্যকর হওয়ার অর্থ হচ্ছে শাসন ও বিচারকার্যে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলন তথা সংসদ সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হওয়া উচিত। সংসদ সদস্যরাও সভাসেমিনারে এমন মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। সংসদ সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে নিচে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হলো-

- ক. কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র : সংসদকে সবকিছুর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা না গেলে সংসদীয় গণতন্ত্র তার কার্যকারিতা পাবে না। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রের সুফল পেতে সংসদকে কার্যকর করা প্রয়োজন।
- খ. দায়িত্বশীল বিরোধী দল গঠন : সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।
- গ. দায়িত্বশীল বিরোধী দল গঠন : সংসদ কার্যকর হলে আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলি আরো দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে।
- ঘ. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রোধ : সংসদে সরকার ও বিরোধী দল সংসদীয় আচরণ করলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে।
- ঙ. সু-শাসন প্রতিষ্ঠা : কার্যকর সংসদ সু-শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদকে কার্যকর করা প্রয়োজন।
- চ. সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা : কার্যকর সংসদ না থাকায় দেশের সরকারের উপর তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে সরকারের আচরণ মাঝেমাঝেই স্বৈরতান্ত্রিক রূপে পরিণত হয়।
- ছ. কার্যকর আইন প্রণয়ন : সংসদীয় কমিটিতে ও সংসদে আলোচনা হলে নতুন আইনের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে এবং জনগণের সার্বিক মঙ্গলে ভালো আইন প্রণীত হয়।
- জ. কার্যকর আইন প্রণয়ন : সংসদ হলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। ফলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।
- ঝ. দুর্নীতি দমন : দুর্নীতিতে আমাদের দেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল। শক্তিশালী সংসদ এই লজ্জাজনক সমস্যা দূর করার প্রধান কেন্দ্র।
- ঞ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন : সংসদ সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র না হওয়াতে সরকার ও বিরোধী দল জাতীয় স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে পারছে না। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।
- ট. আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন : বিরোধী দল সংসদীয় বিরোধীতার স্থলে রাজপথ বেছে নিলে সরকারকেও দমননীতি গ্রহণ করতে দেখা যায় যা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। তাই আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে সংসদ কার্যকর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।
- ঠ. সামরিক শাসনের ঝুঁকি হ্রাস : অকার্যকর সংসদ সামরিক অভ্যুত্থানের নিয়ামক। তাই সামরিক শাসনের ঝুঁকি এড়াতে সংসদকে সবকিছুর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা দরকার।

▲ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা : আধুনিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিরোধী দল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো

১. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি : সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংকটময় মুহূর্তে বিরোধী দল দেশমাতৃকায় সেবার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। বিরোধী দলের এ ভূমিকা জাতীয় সমস্যা সমাধানে বেশ সহায়ক হয়।
২. সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধ : বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের স্বৈরাচারী পথকে রুদ্ধ করে। সরকারি দল বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে স্বৈরাচারী হতে পারে না। ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শান্তি বজায় থাকে।
৩. সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনা : বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। এতে জনরোষের ভয়ে সরকার অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকে এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য হয়।
৪. জনমত গঠন : সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, সভা-সেমিনার, হরতাল অবরোধ প্রভৃতি উপায়ে তাদের নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে এবং ক্ষমতাসীন দলের দোষ-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরে। এভাবে বিরোধী দল নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।
৫. রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার : জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা বিরোধী দলের একটি প্রধান কাজ। সমাজের অসংখ্য সমস্যা ও তার সমাধানের ব্যাপারে বিরোধী দল দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এর ফলে জনগণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলি এবং বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হয়।

৬. সরকারি নীতি সংশোধনী: সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারের নীতি সংশোধনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং ত্রুটিপূর্ণ ও জনস্বার্থবিরোধী নীতিগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে সরকার ভুল নীতিগুলো সংশোধন করতে বাধ্য হয়।
৭. বিকল্প কর্মসূচি পেশ: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল জনগণের সামনে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচি পেশ করে থাকে। ফলে জনগণ একের অধিক কর্মসূচি থেকে যেকোনোটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ পায়।
৮. ছায়া সরকার গঠন: সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য ছায়া সরকার গঠন করে থাকে। এরূপ সরকারের চাপে ক্ষমতাসীন সরকার জনস্বার্থবিরোধী নীতিসমূহ পরিহার করে জনকল্যাণমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।
৯. গণতন্ত্র রক্ষা: সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল গণতন্ত্র রক্ষা ও বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো কারণে সরকারের পতন হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে গণতন্ত্রের ধারার চ্যুতি ঘটে না।
১০. জনগণকে সচেতন রাখা: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল জনগণকে সচেতন রাখে। সরকারি দলের কাজ হলো নীতি প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ। কিন্তু সরকার কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে বিরোধী দল রাজনৈতিক উত্তপ্ততা বজায় রাখে এবং জনগণকে সচেতন করে তোলে।
১১. জনগণের অধিকার রক্ষা: জনগণের অধিকার রক্ষায় বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। অনেক সময় ক্ষমতাসীন সরকার স্বীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য জনস্বার্থবিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সময় বিরোধী দল সমালোচনা, বিক্ষোভ প্রভৃতি কর্মপন্থার মাধ্যমে জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।
১২. আইন প্রণয়নে সাহায্য: আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দল সরকারি দলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকে। বর্তমান সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ছাড়া আইন পাস সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বিরোধী দল সরকারি দলকে সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।
১৩. লোকবল নিয়োগ: অনেক সময় সরকারি পদে লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধী দল প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করে। প্রশাসন যন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিরোধী দল এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ সহজ হয়।
১৪. সংসদীয় কাজে অংশগ্রহণ: বর্তমানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংসদীয় কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। সাধারণত সংসদের কর্মসূচি বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
১৫. বিকল্প সরকার: সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলই বিকল্প সরকার। কেননা বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলে বিরোধী দলকেই দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়।
১৬. সরকারকে আইনের গণ্ডি ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল আইনসভার ভিতরে প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, নিন্দা প্রস্তাব, মূলতবি প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে এবং আইন সভার বাইরে জনসভা, বক্তৃতা-বিবৃতি সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য করে। শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতির সচেতনতাই সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।
১৭. যোগ্য ও দরিদ্র প্রার্থীদের সাহায্য করা: বর্তমানে বিভিন্ন কারণে নির্বাচনী ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সামর্থ্যের অভাবে দরিদ্র এবং মেধাবী প্রার্থীগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এজন্য বিরোধী দলগুলোর উচিত যোগ্য ও দরিদ্র মেধাবী প্রার্থীদের মনোনীত করে নির্বাচনে জয়লাভ করনোর চেষ্টা করা।
১৮. ভোটদানের উৎসাহ: জনমত গঠনের মাধ্যমে ভোটারদেরকে ভোটদানে উৎসাহিত করা বিরোধী দলের অন্যতম কাজ। অনেক সময় যোগ্য নাগরিকগণ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে বিরোধী দল তাদেরকে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা ভোটার বানানোর প্রচেষ্টা চালায়।
১৯. শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তন: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল হচ্ছে বিকল্প সরকার। কেননা নির্বাচনে জয়লাভ করলে বিরোধী দল ক্ষমতা লাভের বা র সরকার গঠনের সুযোগ পায়।। পরিশেষে বলা যায় যে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক গণতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ, জাতীয় সমস্যার সমাধান এবং সর্বাপরি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।



রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়েই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকরূপে রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তবে সংগঠন, সদস্য সংখ্যা, সাংগঠনিক নীতি ও শৃঙ্খলা, কার্য- পরিচালনা পদ্ধতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিচারে রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্যণীয়।

❖ সাদৃশ্য

রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উভয়েই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নির্ধারক। উভয়েই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোভাব ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়েই স্বার্থের সংহতি সাধনের সাথে জড়িত। উভয়েই রাজনৈতিক নিয়োগ বা রাজনৈতিক ভূমিকায় নাগরিকদের অবতীর্ণ করানোর দায়িত্ব বহন করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা উভয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তন, গণ-সংযোগ সাধন, তথ্য সরবরাহ, জনমত গঠন, সরকারের সমালোচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যক্রমে সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। তবে এই দুইয়ের কার্যক্রমের মাত্রা ও গভীরতার মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড আঞ্চলিক অথবা জাতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে।

❖ পার্থক্য/বৈসাদৃশ্য

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক অ্যালেন বল, অধ্যাপক নিউম্যান প্রমুখ আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেছেন। উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

০১. লক্ষ্যের ক্ষেত্রে : সাধারণত বহুমুখী ও ব্যাপক সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। বহু ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাজনৈতিক দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বৃহত্তম জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সাধন। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সামনে বৃহত্তম জাতীয় কল্যাণ সাধনের কোন মহান উদ্দেশ্য থাকে না। সংকীর্ণ ও সমজাতীয় বিশেষ গোষ্ঠীগত স্বার্থ কে কেন্দ্র করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উৎপত্তি।
০২. উৎপত্তিগত ক্ষেত্রে : সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। এই মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় নীতি ও ব্যাপক কর্মসূচি রচিত হয় এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উৎপত্তির ভিত্তিতে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে না। এ সমস্ত গোষ্ঠীর অঙ্গীকার থাকে গোষ্ঠীগত স্বার্থ বা কল্যাণের প্রতি।
০৩. সংহতির প্রশ্নে : একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক থাকতে পারে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংহতির প্রশ্ন বড় করে দেখা দেয়। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংহতির সমস্যা বড় একটা দেখা দেয় না। কারণ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা রাজনৈতিক দলের তুলনায় সাধারণত কম হয় এবং অভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠীর সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকে।
০৪. সাংগঠনিক ক্ষেত্রে : চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় রাজনৈতিক দল অনেক বেশি সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ। অভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় শৃঙ্খলার ভিত্তিতে দলীয় সংহতি বজায় রাখার ব্যবস্থা হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। দলীয় কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকার ও আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে।
০৫. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বহুমুখী ও ব্যাপক হলেও, রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে দলীয় নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হল দলের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে, দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন করে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করাই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।

০৬. কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে : রাজনৈতিক দলের কর্ম পদ্ধতি প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বক্তব্য ও কর্মসূচি সরাসরি জনগণের কাছে পেশ করে। এ কারণে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণ সহজেই অবহিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড পরোক্ষভাবে এবং কখনো-কখনো গোপনে সম্পাদিত হয়। জনসাধারণের সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আগ্রহ বা উদ্যোগ বড় একটা দেখা যায় না।
০৭. সমঝোতার ক্ষেত্রে : প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক জোট নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ধরনের সমঝোতা খুব একটা দেখা যায় না।
০৮. নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে : প্রতিটি রাজনৈতিক দল দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। তবে এই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো নিজস্ব স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দল বা প্রার্থীকে সমর্থন এবং তার পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারে।
০৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে : কর্ম পদ্ধতির প্রকৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান। অভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে কোন বিষয়ে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত থাকে বিধায় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব সহজে সম্ভব হয় না।
১০. অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে : আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুব একটা দৃশ্যমান হয় না।
১১. মতাদর্শের পার্থক্য : রাজনৈতিক দল ব্যাপক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মতাদর্শগত অঙ্গীকার পূরণের জন্য রাজনৈতিক নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অঙ্গীকার সাধারণত স্বার্থের প্রতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি নয়। তবে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে না।
- পরিশেষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ থাকে সদস্য নিয়োগ, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালনা, সরকারের কর্মসূচি নির্ধারণ ও প্রয়োগ। পক্ষান্তরে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা।

STUDENT



STUDY

নেতৃত্ব

নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership' শব্দটি ইংরেজি 'Lead' থেকে এসেছে। 'Lead' শব্দের বাংলা অর্থ হল পরিচালনা করা, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, পথ দেখান এবং সামনে থেকে পরিচালনা করেন তাকে নেতা (Leader) বলে। আর নেতার গুণাবলিকে বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব।

সুতরাং 'নেতৃত্ব' বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বুঝায়। কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যদেরকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তার নিরীখেই নেতৃত্বের পরিমাপ হয়। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে কাজিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত, পরিলক্ষিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ হয়। একজন ব্যক্তির কার্যনির্বাহ বা আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োগের ক্ষমতাই নেতৃত্ব। সুযোগ্য নেতৃত্বেও বদৌলতে কোন দেশ উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে।

স্টকডিল (Stogdill)-এর মতে, 'Leadership may be considered as the process (act) of influencing the activities of an organized group in its efforts toward goal setting and goal achievement'. অর্থাৎ নেতৃত্ব হচ্ছে এমন কার্য বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন একটি সংগঠিত দল তাদের লক্ষ্যাদি নির্ধারণ এবং সেগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যমুখী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। অন্যদিকে কোহেন (Cohen) মনে করেন নেতৃত্ব হলো কোন কাজ বা প্রকল্প সম্পাদন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অপরের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ব্যবহার করার কৌশল বা দক্ষতা। (Leadership is the art of influencing others to their maximum performance to accomplish any task, objective or project).

এইচ. ও ডানেল (H.O. Dunel) এর মতে, “সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে।” আবার ডব্লিউ গোল্ডনার (W. Gouldner) বলেন, “নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে।” কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) এর মতে, “নেতৃত্ব হল ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।”

সুতরাং নেতৃত্ব হল একটি শক্তিশালী কৌশল বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেতা অন্যের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে। নেতৃত্ব হল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির সেই সব গুণাবলি যা সমাজ বা রাষ্ট্রের কাজিত লক্ষ্য অর্জনে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে। যোগ্য নেতৃত্বের কারণে একটি দেশ যেমন সফলতার শীর্ষে আরোহণ করতে পারে, তেমনি অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে কোন রাষ্ট্রে অধঃপতন নেমে আসতে পারে।

➤ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েক প্রকার নেতৃত্বের কার্যকারিতা তুলে ধরা হলো।

- ১। **সম্মোহনী নেতৃত্ব (Charismatic Leadership)** : জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম সম্মোহনী নেতৃত্বের ধারণা দেন। কোন বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, কর্মপদ্ধতি ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল স্পর্শে রাষ্ট্রের নাগরিকদের তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলে। জনগণ সম্মোহনী নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডে আপ্ত, বিমুগ্ধ ও অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে যায় সম্মোহনী নেতৃত্ব। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে এমন কি স্বাধীনতা অর্জনে অদম্য ভূমিকা রাখেন। সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী হলেন ব্রিটিশ ভারতের মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ।
- ২। **বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব** : যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞান, উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে কোন সংঘ বা সংগঠনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তখন ঐ ব্যক্তির এরূপ গুণকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব বলে। কবি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, শিল্পী, অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃত্ব আসতে পারে।
- ৩। **রাজনৈতিক নেতৃত্ব** : রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোন রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে সংগঠিত করার কাজে সাফল্য লাভ করে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠেন। ব্রিটিশ ভারতের মহাত্মা গান্ধী, অবিভক্ত বঙ্গে এ কে ফজলুল হক, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ প্রমুখ ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ৪। **প্রশাসনিক নেতৃত্ব** : প্রশাসনের সাথে যে সকল ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত তাদের কোন প্রশাসনের বিশেষ যোগ্যতা, সাফল্য, দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলির ফলে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে প্রশাসনিক নেতৃত্ব বলে।
- ৫। **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব** : যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অথবা সংগঠনের সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। একজন গণতান্ত্রিক নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ বন্টন করেন।
- ৬। **তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব** : একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। একক শাসক হিসেবে নেতা সকল কার্য পরিচালনা করেন। সংগঠনের কাজে তার মতামতই প্রাধান্য পায়; জনগণের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না।
- ৭। **সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব** : সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার কোন বিশেষ দিক সংস্কারের জন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করা সমাজ সংস্কারকের অন্যতম প্রধান কাজ। যেমন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, বেগম রোকেয়া, কাজী আব্দুল ওদুদ, সুফিয়া কামাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে নন্দিত।
- ৮। **প্রতীকধর্মী নেতৃত্ব** : যে নেতা তার দেশ ও জাতির প্রকৃত ক্ষমতাসালী না হয়েও, মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নেতৃত্ব দান করেন তাকে প্রতীকধর্মী নেতৃত্ব বলে। যেমন, ব্রিটেনের রাজা বা রাণী, থাইল্যান্ডের রাজা প্রমুখ।
- ৯। **সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব** : সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ ধরনের নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সবকিছু নেতা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের রাষ্ট্রে সংবিধানের জায়গায় নেতার ইচ্ছাই সর্বোচ্চ আইন হয়ে উঠে।
- ১০। **বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব** : চিন্তা ও সৃজনশীল জগতে আলোড়ন ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞান, মেধা ও লেখনীর মাধ্যমে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন। যেমন, প্লেটো, কার্ল মার্কস, জাঁ জ্যাক রুশো প্রমুখ।

পরিশেষে বলা যায়, নেতৃত্বের প্রকারভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও এর মূল লক্ষ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করা।

➤ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

মার্ক মিলার মনে করেন, “আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সং সাহস, বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রভৃতি একজন যোগ্য নেতার গুণাবলি।” অধ্যাপক মিশেলস বলেন, “নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।” দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, “নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হল আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা।” নিম্নে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি উল্লেখ করা হল।

- ✍ **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব :** নেতাকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া উচিত। চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য, তেজস্বিতা, নমনীয়তা, বাগ্মীতা প্রভৃতি গুণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।
- ✍ **বুদ্ধিমত্তা :** বুদ্ধিমত্তা নেতার আবশ্যিকীয় গুণ। নেতা তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করে জনগণের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নির্বোধ ও বুদ্ধিমত্তাহীন ব্যক্তি ভালো নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।
- ✍ **শিক্ষা :** শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বৃদ্ধি করে। যার জন্য নেতাকে নিজস্ব বিষয়ে শিক্ষা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি জনগণের ভালো নেতা হতে পারেন না।
- ✍ **মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা :** মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি নেতা হতে পারেন না। নেতাকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সুস্বাস্থ্য ছাড়া নেতা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। নেতার কর্ম দক্ষতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার উপর।
- ✍ **অভিজ্ঞতা :** যিনি যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। অভিজ্ঞতা ব্যতীত যে কোন কর্ম পরিকল্পনা পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। কেননা নেতার কর্ম কল্পনার উপর দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে।
- ✍ **বাগ্মীতা ও উত্তম শ্রোতা :** বাগ্মীতা নেতার অন্যতম গুণ। নেতা ভালো বক্তৃতা দানে সক্ষম হলে শ্রোতার তার কথা অগ্রহের সাথে শ্রবণ করেন। বাগ্মী নেতা জনগণের মন জয় করে নিতে পারেন। ভালো বক্তৃতাদানের সাথে একজন নেতাকে জনগণের কথা মনযোগের সাথে শুনতে হবে এবং সেরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ✍ **দূরদৃষ্টি :** দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন নেতা ভবিষ্যতের সমস্যার ব্যাপারে আগে থেকে ধারণা করায় সক্ষম থাকেন। ভবিষ্যতের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে তিনি চিন্তা করতে পারেন। এমন গুণাবলি সম্পন্ন নেতা যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।
- ✍ **ধৈর্য ও সহনশীলতা :** নেতাকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। যে কোন জটিল পরিস্থিতি নেতাকে ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়।
- ✍ **নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি :** একজন ভালো নেতা কখনো আংশিক জনগোষ্ঠীর হতে পারে না। তিনি সার্বজনীন নেতা। তাই তাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের কাছে নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতে হবে।
- ✍ **দেশপ্রেম :** একজন নেতাকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। দেশদ্রোহী কোন কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি যেমন সম্পৃক্ত হবেন না, তেমনি তার অনুসারীদেরকেও এধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- ✍ **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা :** নেতাকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা জাতিকে সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে।
- ✍ **ন্যায়পরায়ণতা :** নেতাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তিনি হবেন ন্যায়-নীতির প্রতীক। সকল শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি সমান গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি হবেন উন্নত সং চরিত্রের অধিকারী।
- ✍ **উদারতা :** নেতা হবেন উদার মনের অধিকারী। নেতাকে ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে সর্বজনের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতাকে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে।
- ✍ **প্রতিশ্রুতি রক্ষা :** নেতাকে অবশ্যই তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি নেতাকে পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ নেতাকে তার কথা ও কাজের মিল রাখতে হবে।
- ✍ **আত্মবিশ্বাসী :** নেতার অন্যতম গুণ আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসহীন কোন নেতা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই নেতাকে অবশ্যই কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।
- ✍ **মিষ্টভাষী :** একজন ভালো নেতাকে রুঢ় আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে হতে হবে মিষ্টভাষী, সদালাপী, নিরহংকারী, সদাহাস্যোজ্জ্বল এবং কঠোর পরিশ্রমী।

পরিশেষে বলা যায়, একটি ভালো রাষ্ট্রের জন্য একজন ভালো নেতা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক নেতৃত্ব থাকলে পিছিয়ে পড়া যে কোন দেশ ও জনগোষ্ঠী উন্নয়নের ধারায় অবতীর্ণ হতে পারে।

STUDENT



STUDY

নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ সাংবিধানিক সংস্থা। একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটগ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা : প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন [১১৮ (১)]। একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনের সভাপতি হবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার [১১৮ (২)]। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনে অধিনে থেকে স্বাধীন ভাবে দায়িত্ব পালন করবে [১১৮ (৪)]।

নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ : নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বৎসরকাল হবে [১১৮ (৩)]।

তবে ১১৮ (৩) (ক) অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তির পর প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না এবং ১১৮ (৩) (খ) অনুযায়ী একজন নির্বাচন কমিশনার। শুধুমাত্র প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন, অন্য কিছু না।

অপসারণ : সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণে ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন। [১১৮ (৫)]। তবে কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন [১১৮ (৬)]।

উল্লেখ্য, ১১৮ (৫) অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের কর্মে শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী : সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী এবং রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নির্ধারিত হইবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১৯ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী হলো-

১. রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী-

রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে [১১৯ (১) (ক)] : এই সংক্রান্তে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩ (১)]। তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তা পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩ (২)]।

সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে [১১৯ (১) (খ)] : এই সংক্রান্তে বলা যায় যে, সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে [১২৩ (৩)]। সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১২৩ (৩) (ক) অনুযায়ী মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙ্গে যাবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং ১২৩ (৩) (খ) অনুযায়ী মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১২৩ (৪)। তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তা হলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে [১১৯ (১) (গ)] : সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করতে পারবেন, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করবে [১১৯ (১) (ঘ)]।

উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করবে ১১৯ (২)।

উল্লেখ্য সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলে বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসনবন্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না [১২৫ (ক)]।

সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না [১২৫ (খ)]।

কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নন্যাটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান। করে, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করবে না [১২৫ (গ)]।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে (১২৬)।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব : নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যোগ্য, উপযুক্ত ও জনগণের পছন্দনীয় প্রার্থী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। নিম্নে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অবাধ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করেছে। সমগ্র দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ যাতে তাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করতে পারে এ জন্যে এই বিভাজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার পরিমাণকে ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এলাকা বিভাজন করে।
২. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা : নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রদান করে। এতে করে প্রার্থী ও ভোটাররা নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয় এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারে। নির্বাচনের নিয়ম-কানুন, ভোটদানের নিয়ম, প্রার্থীর যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় নির্বাচনী তফসিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
৩. ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান : স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদকরণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জালভোট প্রতিরোধে ভোটারদের জন্যে ছবিযুক্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করেছে।
৪. নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ : নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ পর্যায়ে। প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। এ সময় প্রার্থীদের প্রচারণা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বিষয় সূক্ষ্মলব্ধ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে।
৫. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান ও নির্বাচনী দায়িত্ব বণ্টন : নির্বাচন হলো একটি প্রক্রিয়া; সেখানে প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচার, ভোট দানের রীতি-নীতি থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। তাই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে নির্বাচন কমিশন তার অধীনে কর্মকর্তাদের নির্বাচনী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে রিটার্নিং ও পোলিং অফিসার। হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যালট পেপার ও বাক্স সরবরাহ : অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স সরবরাহ করে। বর্তমানে অবশ্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। ভোটদান প্রক্রিয়ায় আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন বর্তমানে ভোট সংগ্রহে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে ইভিএম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
৬. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ : নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিচার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। নির্বাচন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা, নির্বাচনী সহিংসতা রোধ ও নিরাপত্তার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে বিচার সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করতে হয়। প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল থেকে শুরু করে, জালভোট প্রদান এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কর্তব্যরত কর্মকর্তা তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৮. পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা প্রদান : স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনে নির্বাচন কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা প্রদান করেন। ফেমা (FEMA), ইইউ (ইউ) প্রভৃতি পর্যবেক্ষক দলের নির্বাচন পরবর্তী প্রতিবেদন নির্বাচন স্বচ্ছতা সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা : বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের যে সকল দুর্বলতা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- দলীয় লেজুড়বৃত্তি, অপরিপূর্ণ ও প্রশিক্ষণবিহীন জনবল, সেকেন্দ্রে কারিগরি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিজ্ঞানের স্বল্পতা, অর্থনৈতিক সংকট, সমন্বয়হীনতা, প্রচার বিমুখতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব।

বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। আর এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তার অভাব। এক্ষেত্রে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের আবশ্যিকতা বর্তমানে জাতির জন্যে অপরিহার্য। বাংলাদেশের মানুষ। অপেক্ষা করছে একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের জন্যে।

STUDENT



STUDY

নির্বাচনের সময় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা/গুরুত্ব

তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ। আর এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গোলযোগপূর্ণ। নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, পেশী শক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্যা বিদ্যমান। এ জন্যই বাংলাদেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই দেশবিদেশি বিভিন্ন সংস্থা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের সময় নির্বাচন পরিষ্কৃতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে। সুষ্ঠু পর্যবেক্ষক দলগুলোর তদারকির কারণেই নির্বাচন আরো সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।

পর্যবেক্ষক : পর্যবেক্ষক হচ্ছে পর্যবেক্ষণকারী বা পরিদর্শক। পর্যবেক্ষক দলসমূহ দেশি-বিদেশিদের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা বা পর্যবেক্ষক দল এদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিয়ে পরিচালিত হয়। নির্বাচনের সময় তারা নিবিড়ভাবে নির্বাচনের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেন। শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত পর্যবেক্ষণ সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

✚ নিম্নে কয়েকটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থার নাম দেওয়া হলো-

- জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ- জানিপপ
- ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ
- ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স- ফেমা
- বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ- বামাসপ
- ডেমোক্রেসি ওয়াচ
- আইন সহায়তা কেন্দ্র- আসক
- ব্রতী
- সোসাইটি ফর রুরাল বেসিক নিড- শ্রাবন
- পলিসি রিসার্চ স্টাডিজ ফাউন্ডেশন- সিআরএসএফ

বিভিন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা : বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচন ছাড়াও এ যাবত দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে, দ্বিতীয়টি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে, তৃতীয়টি ৭ মে ১৯৮৬ সালে, চতুর্থটি ৩ মার্চ ১৯৮৮ সালে, পঞ্চমটি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে, ষষ্ঠটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে, সপ্তমটি ১২ জুন ১৯৯৬ সালে, অষ্টমটি ১ অক্টোবর ২০০১ সালে, নবমটি ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে এবং দশম নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনই ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রদান করেন। এর ফলে নির্বাচনের সার্বিক দিক স্বচ্ছতার সাথে উঠে আসে। অল্প কথায় বলতে গেলে নির্বাচনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় পর্যবেক্ষক দলসমূহের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। তবে পর্যবেক্ষকেরা কোনোভাবেই নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না। নির্বাচনকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি এবং দক্ষতার সাথে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে মনোযোগী থাকবেন। পর্যবেক্ষণগণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেন না এবং যেখানে অবস্থান করলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন জায়গায় অবস্থান করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন।

পর্যবেক্ষক দলসমূহের কার্যক্রম : পর্যবেক্ষকেরা পর্যবেক্ষণ করে তাদের নির্দিষ্ট ফরম জমা দিবে। ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হলে এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফরম EO-4 পূরণ করে নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে ঐ প্রতিবেদনে। ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশমালা থাকবে। তবে এই প্রতিবেদনের কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুত কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত হবে না। পর্যবেক্ষক সংস্থার দেওয়া তথ্যগুলো নির্বাচনের হালচাল তুলে ধরে। যেকোনো জাতি তথা সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। সুষ্ঠু নির্বাচন সেক্ষেত্রে আরো জরুরি। পর্যবেক্ষক সংস্থা ন্যায়নিষ্ঠ সমালোচনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পথ দেখাতে পারে তেমনি জাতীয় উন্নতির জন্য যুক্তিসংগত সুপারিশও রাখতে পারে। সুতরাং এজন্য সরকারের উদার ও সহিষ্ণু নীতি থাকা প্রয়োজন। পর্যবেক্ষক মোতামেয়েনের একক ইউনিট হবে উপজেলা। মেট্রোপলিটন থাকা অথবা সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং এর ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (Scale) নির্ধারণ করা হয়।

✚ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা

০১. অবোধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনোরূপ ত্রুটি হয়ে থাকলে তা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করা।

০২. নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন নির্বাচনী উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা অবহিত হওয়া, যাতে ভবিষ্যতে চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়।
০৩. নির্বাচনী পরিবেশ এবং উহার ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ।
০৪. সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করা।
০৫. নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।
০৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোনো নির্বাচনের বিশেষ ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, ইহা শুধু নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে সঠিক ও সত্যতার সাথে দৃষ্ট ও সময়ানুযায়ী রিপোর্ট প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত।
০৭. নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান ছাড়াও নির্বাচনে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের আস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

পর্যবেক্ষক দলসমূহ নিরপেক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থেকে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রত্যাশা পর্যবেক্ষক দলসমূহের। স্বাভাবিক নির্বাচন জনগণের সরকার উপহার দেয়। যে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হলে জনগণ তার সুফল ভোগ করে। নির্বাচন। প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে নিপতিত হয়। দেশের অর্থনীতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সকল অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়। সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতু হিসেবে নির্বাচন বড় ভূমিকা পালন করে। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

STUDENT



STUDY

সরকারী কর্ম কমিশন

কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা : আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে (১৩৭)।

নিয়োগ : প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন [১৩৮ (১)]। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হবেন, যারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্মাবসানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না [১৩৯ (৪)], তবে কর্মাবসানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন এবং কর্মাবসানের পর কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন।

মেয়াদ : এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বৎসর বা তার পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ হওয়া এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন [১৩৯ (১)]।

অপসারণ : সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হবে না [১৩৯ (২)]। কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদত্যাগ করতে পারবেন [১৩৯ (৩)]।

১ দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ক. সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেইরূপ হবে [১৩৮ (২)]।

খ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা [১৪০ (১ক)]।

গ. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান [১৪০ (খ)]।

ঘ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

ঙ. প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বৎসরে স্থায়ী কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবে এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে (১৪১ (১))। রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকবে, যাতে কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সেই ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ গৃহীত না হবার কারণ এবং যে সকল ক্ষেত্রে

কমিশনের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সে সকল ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ না করার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করবে। যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন [১৪১ (৩)]।

রাষ্ট্রপতির সাথে কমিশনের পরামর্শ : সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সাথে অসামঞ্জস্য নয়) বিধানবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন [১৪০ (২)] :

- ক. প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- খ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;
- গ. অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি এবং
- ঘ. প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।।

STUDENT



STUDY

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা সমূহ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো যোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তির নির্বাচনে না আসা। অধিকাংশ অযোগ্য লোক নির্বাচনে আসে এবং তারা অর্থের জোরে, পেশী শক্তির জোরে, পারিবারিক ঐতিহ্যের জোরে নির্বাচনে জয়ী হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় সরকার কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অপারগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাছাড়া দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বহীনতা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক বলে বিবেচিত। নিচে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি : সরকারি সম্পদ ও সেবার সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করাই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অথচ সরকারি বণ্টনব্যবস্থাকে রাজনীতিকীকরণের ফলে স্থানীয় সরকার পরিণত হয় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট আর অব্যবস্থাপনার প্রাণকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃবর্গ তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেন। যথা : বিভিন্ন টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান; হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ঘাট প্রভৃতি নিজেদের লোকদের ইজারা প্রদান; বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান প্রভৃতি।
২. উপদলীয় কোন্দল ও দ্বন্দ্ব : বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেখানে বিভিন্ন দল-উপদল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কেননা প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এ সকল দ্বন্দ্ব হলো সাধারণত উপজেলা চেয়াম্যান ও সাংসদদের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিজেদের মধ্যে।
৩. জনগণের অংশগ্রহণের অসারতা : স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু এর বাস্তবতা উল্টো সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
৪. স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর : বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও তারা এতে ব্যর্থ হয়। তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায় করতে পারেনি।
৫. নির্বাচনী গণতন্ত্রের অপমৃত্যু : ১৯৮৫, ১৯৯০, ২০০৯ ও ২০১৪ সালে দেশে চারটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এসব নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের চেয়ে সন্ত্রাস, কারচুপি, ব্যালট বাক্স চুরি প্রভৃতিরই প্রাধান্য ছিল এবং নির্বাচন উপহাসে পরিণত হয়েছিল সর্বশেষ চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও সরকারি দলের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৬. গ্রামীণ টাউন্টদের উৎপত্তি : বিকেন্দ্রীকরণের নামে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারি অফিস-আদালতে জনগণের প্রবেশের পথ মোটেও সুগম হয়নি। বরং একে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় এক শ্রেণীর টাউন্টের উৎপত্তি হয়, যারা জনগণের হয়ে এসব অফিস-আদালতে ধন্য দেয় এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে।

৭. **মামলা-মোকদ্দমার অশুভ পরিণতি** : বিকেন্দ্রীকরণের একটা উদ্দেশ্য হলো বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কেননা তখন জনগণের অতি সাধারণ বিষয়েও মামলা-মোকদ্দমা করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালীরা অহেতুক তাদের বিরোধীদের হয়রানির জন্য এ সুযোগ কাজে লাগায়।
৮. **সমণ্ডের অভাব** : স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে সমণ্ডের যথেষ্ট অভাব থাকে। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস চরম আকার ধারণ করে।
৯. **অমনোযোগী নেতৃত্ব** : স্থানীয় সরকারের নেতারা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিও তেমন মনোযোগী হন না। তাদের অধিকাংশই রাজধানী কিংবা জেলা শহরগুলোতে অবস্থান করেন। ফলে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা খোঁজখবর কমই রাখতে পারেন।
১০. **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের আঞ্চলিকতা** : উপজেলা উন্নয়ন কমিটির মিটিংয়ের সময় চেয়ারম্যানরা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এতে সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন বৈষম্য দেখা দেয়।

রাষ্ট্র পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং স্থানীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ১৯৭০-১৯৮০ দশক-পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে পৃথিবীব্যাপী যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের খুব বেশি আধুনিকায়ন হয়নি বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। তাই রাষ্ট্র প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং ক্ষমতার স্বচ্ছ বণ্টন প্রদানপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ যুগোপযোগী করে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করলে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হবে।

STUDENT



STUDY

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশের সংসদ ভবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

(৩৬ তম বিসিএস)

জাতীয় সংসদ : রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এর বিশালত্বের মাঝেই নিহিত। বৃত্তাকার ও আয়তাকার কংক্রিটের সমাহার ভবনটিকে দিয়েছে এক বিশেষ স্থাপত্যিক সৌন্দর্য যা এর মহান উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে এক মিলিটারি ক এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রিত করার প্রতিজ্ঞা করেন- যা ইসলামিক গণতন্ত্রের অধীনে প্রায় ১,৬০০ কিমি (৯৬০ মাইল) ব্যবধানে বিভক্ত ছিল। প্রাথমিকভাবে লুই আই কান কে পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদে সরকারের নির্বাহী বিভাগের মূল ভবনের স্থপতি হিসেবে নির্বাচন করা হলেও পরবর্তীতে সে কাজ আর এগোয়নি।

১৯৫৯ সালে প্রথম ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্সটির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তৎকালীন সামরিক সরকার পাকিস্তানের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় রাজধানী শেরে বাংলা নগরে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংসদ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে বর্তমান সংসদ ভবনটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর লুই কান ভবন কমপ্লেক্সটির নকশা প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত হন। তাঁকে সরাসরি কাজে নিযুক্ত না করে ভবনের প্রাথমিক নকশা প্রদানের জন্য বলা হয়। এবং ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তিনি আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পান। আর তাই কানও দিল্লী ও আত্মার মুঘল প্রাসাদগুলোর অনুকরণে একাধিক “দুর্গ” বা citadel নির্মাণের পরিকল্পনা। করেন- যার একটি “দুর্গ” বা ভবন, সংসদ হিসেবে ও অন্যান্য ভবনগুলো অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হবে। যেমন: বিদ্যালয়, পাঠাগার, যাদুঘর কিংবা মার্কেট ইত্যাদি। তিনি এই দুই মূল “দুর্গ” কে ইংরেজী ‘V’ আকৃতির একটি লেকের মাধ্যমে বিভাজিত করেন, যা দেশটির নদীমাতৃক পটভূমিকে আলোকিত করবে পৃথিবীর সর্বনিম্ন পানির উচ্চতায় থাকা গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপ বহনকারী এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া অসংখ্য নদী দেশটির মূল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। কান এ ও চিন্তা করেন যে, লেক খননে যে অতিরিক্ত মাটি সরানো হবে তা দিয়ে এই স্থাপনা কে নিয়মিত বন্যা থেকেও সুরক্ষিত করা যাবে।

নিয়মিত কাজ শেষে ১৯৮২ সালে এসে লুই আই কান এর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের স্বার্থে সৃষ্ট তাঁর এই প্রাসাদসম স্থাপনার নির্মাণকাজের সমাপ্তি ঘটে। যার উপলক্ষ ছিল সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার এক পীঠভূমি সৃষ্টি, এমন একটি দেশে যেখানে একাধিকবার একনায়কতন্ত্রের আফালন ঘটেছে। আর এরই মধ্যে আবার অতীত থেকে নেয়া ইউরোপীয় ও প্রাচ্যের বিভিন্ন শিল্পশৈলীর এক অসামান্য মিশেল সৃষ্টি করে কান একই সময়ে পুরোনোকে বিদায় জানানোর চেষ্টাও করেছেন। হয়তোবা ব্রিটিশ-পরবর্তী নতুন ধারার যে স্থাপত্যশৈলী

এই অঞ্চলে প্রসার হচ্ছিল তার প্রতি কান কোন পাতাই দেননি, কিন্তু যারা এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের জন্য এটা সত্যিকার অর্থেই নতুন এক সংযোজন।

▶ জাতীয় সংসদ ভবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

০১. আইন প্রণয়ন স্থল : জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদ সদস্যগণ দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশের আইনসভা জাতীয় সংসদের সকল কার্যকলাপ পরিচালিত হয় এ ভবনকে কেন্দ্র করে। তাই জাতীয় সংসদ ভবনের গুরুত্ব অপরিসীম।
০২. শপথ গ্রহণ স্থল : বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জাতীয় সংসদ ভবনে শপথ গ্রহণ করেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, স্পিকারসহ মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্য এ পবিত্র ভবনে রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা এবং স্বীয় দায়িত্ব যথার্থভাবে পালনের শপথ গ্রহণ করেন। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের এ ভবনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

▶ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

(৩৫তম বিসিএস)

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে নিম্নোক্ত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে :

▶ নির্বাচন কমিশনের গঠন

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

১. প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।
২. একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতি রূপে দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বৎসরকাল হবে এবং
ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না;
খ. অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।
৪. নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।
৫. সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, তেমনটি হবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপের পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সে ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।
৬. কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পরিবেন।

▶ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি: সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কাজ বা দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী
ক. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন;
খ. সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন;
গ. সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবেন; এবং
ঘ. রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন।
২. উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সেরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশন তার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে। এছাড়া বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মর্যাদাসম্পন্ন ১০টি আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা নির্বাচন কার্যালয় এবং উপজেলা/থানা পর্যায়ে ৫১৪ টি উপজেলা ও থানা নির্বাচন কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মশালাসহ নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের আইনে একজন সাংসদের জন্য নির্বাচনী ব্যয়ের একটি ধারাবাহিক পরিবর্তন চিত্র :

(৩৫তম বিসিএস)

২০০১ সাল থেকে বর্তমান সময় অর্থাৎ ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সর্বশেষ ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনে একজন প্রার্থী পোস্টার, ব্যানার, সভা, প্রচারণা প্রভৃতিতে বিরাট অংকের টাকা খরচ করে থাকেন। যদিও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একজন প্রার্থীর ব্যয়সীমা উল্লেখ করা থাকে এবং প্রার্থীর নির্বাচনী খরচ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা যাবে। এমনকি নির্বাচন কমিশন ঐ প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। তাই নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়সীমা একটি উল্লেখযোগ্য বিধি। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনেই নির্বাচন কমিশন এই বিধিকে প্রয়োগ করে। এমনকি স্থানীয় নির্বাচনেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে ২০০১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যয়সীমা তুলে ধরা হলো :

সংসদ	নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কাল	প্রার্থীদের অনুমোদিত ব্যয়সীমা
অষ্টম	২০০১	৫ লাখ
ইবম	২০০৮	১৫ লাখ
দশম	২০১৪	২৫ লাখ
একাদশ	২০১৮	৩৫ লাখ

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ২০০৬ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে সেটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উপরের সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অষ্টম সংসদ নির্বাচনে যেখানে একজন প্রার্থী ৫ লাখ টাকা ব্যয় করতে পারত, সেখানে নবম সংসদ নির্বাচনে ব্যয়সীমা করা হয় ১৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ ব্যয়সীমা বেড়েছে ২০০ শতাংশ। আবার দশম সংসদের ক্ষেত্রে বেড়ে দাড়িয়েছে ২৫ লাখ টাকায় অর্থাৎ নবম সংসদের তুলনায় দশম সংসদ নির্বাচনে বেড়েছে ৬৭ শতাংশ এবং অষ্টম সংসদ নির্বাচনের তুলনায় দশম সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর অনুমোদিত ব্যয়সীমা বেড়েছে ৫০০ শতাংশ। কিন্তু সংবাদপত্র ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবেচনায় অধিকাংশ প্রার্থীর প্রকৃত নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমাকে আরো ছাড়িয়ে যায়। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীকে সতর্ক করলেও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে খুব একটা দেখা যায় না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের এ ক্ষেত্রে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জরুরি বিধানাবলির সারমর্ম ছিল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও এ আইনের আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে এ আইনের অপপ্রয়োগ করছে। জাতীয় সঙ্কটময় মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনি রাজনৈতিক হীন স্বার্থে রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যান্য নাগরিককে হয়রানির উদ্দেশ্যে এ আইনে নিবর্তনমূলক আটক অব্যাহত।

রুলস অব বিজনেস

রুলস অব বিজনেস হলো সরকারি কার্যবিধিমালা। অর্থাৎ যে দলিল অনুযায়ী (কার্য বিধিমালা) বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলি বন্টন করা হয় এবং কে, কোন দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে পালন করবে, কোন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি কিরূপ হবে তা নির্ধারণ হয় তাকেই বলা হয় রুলস অব বিজনেস। রুলস অব বিজনেস মূলত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় এবং সেই সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত রাখে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি রুলস অব বিজনেস' সংশোধন করতে পারেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান?

মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে যে সব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক;
২. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;
৩. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;
৪. বাংলাদেশ স্কাউট;
৫. এশিয়াটিক সোসাইটি।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা

সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও দূর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এমন একটি ধারণা, যা নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে প্রশাসনের যথাযথ সাড়া দান নিশ্চিত করে। যার ফলে সরকার নাগরিকদের জন্য যা করছে নাগরিকগণ তা জানতে পারে, অন্যদিকে সরকারও অনুমান করতে পারে যে, জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মৌলনীতি হচ্ছে তথ্য সামগ্রীতে ভোক্তা সাধারণের প্রবেশাধিকার যাতে করে তাদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের পদবিন্যাস

বাংলাদেশ সচিবালয় প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়ে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। সচিবের কাজে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত সচিব থাকেন। মন্ত্রণালয়ের এক একটি অনুবিভাগের জন্য একজন যুগ্ম সচিব, একাধিক শাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব এবং প্রতি শাখার দায়িত্বে একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব বা সহকারী সচিব থাকেন। সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো হচ্ছে : মন্ত্রী → সচিব → অতিরিক্ত সচিব → যুগ্মসচিব → উপসচিব → সিনিয়র সহকারী সচিব → সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক?

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী।

এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকার নারীদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করেছে। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। পৌরসভা নির্বাচনেও সে রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন নারীদের দাবি ও সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়েছে। এতে নারীরা প্রশাসনে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নারীর সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসন

বাংলাদেশে বর্তমানে এক কেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থা (Unitary form of government) প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকার প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীকে তার কাজে সহযোগিতা করে। সচিবগণ মন্ত্রণালয় বা একটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ ৪২টি মন্ত্রণালয় রয়েছে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে গোটা দেশকে ৮টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একজন বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এ আটটি বিভাগের অধীন মোট ৬৪টি জেলা আছে। একজন উপ-কমিশনার (Deputy Commissioner) জেলার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার অধীন ৪৯৩টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ

বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত। জেলা তিনটি হলো রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি। এ জেলা তিনটির সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে ‘পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল’ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করে আইনে পরিণত করা হয়। ১৯৮৯ সালে ৬ মার্চ এ বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এ আইনের লক্ষ্য হলো: ১. উপজাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ২. প্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যে উপজাতীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা। ৩. উন্নয়নমূলক কাজে উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

❖ আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যাবলি

১. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।
২. বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন।
৩. স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধন।
৪. কৃষি, বন, মৎস্য ও সমাজকল্যাণ।
৫. ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সংগঠন ও সংরক্ষণ করা।

❖ পরিষদের ক্ষমতা

১. পুলিশ : সহকারী সাব-ইনসপেক্টর অব পুলিশ এবং তার অধস্তন সকল পুলিশ কর্মকর্তা পরিষদ নিয়োগ করবে এবং দায়িত্বের ব্যাপারে পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে।
২. ভূমি হস্তান্তর : পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো জায়গাজমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নন এরকম কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।
৩. বিরোধের অবসান : সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় হেডম্যান তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ

কোনো দেশের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ তার ক্ষমতার অবস্থান ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প হতে পারে- প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে এ উভয় অবস্থাই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনার প্রধান্যের ফলে বিকেন্দ্রীকরণই তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্ব ও কাজ যখন কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে অধস্তন সংস্থাসমূহের বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ডুয়াইট ওয়ালডো (Dwight Waldo) বলেন, বিকেন্দ্রীকরণ বলতে স্থানীয় কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও দায়িত্বকে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থার নিকট হস্তান্তরকে বোঝায়।

Prof. Allen- এর মতে কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন ক্ষমতা ব্যতীত অপর ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে ভারার্পণের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।

সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ওপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নতর পর্যায়ে ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে এবং সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় এদের সকলের কাজের সমন্বয় জরুরি বলে বিবেচিত হয়।

পিএটিসি (PATC) বা লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Public Administration Training Centre (PATC) বা লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কর্ম কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশবলে সাবেক Bangladesh Administrative Staff College (BASC), National Institute of Public Administration (NIPA), Civil Officers Training Academy (COTA) Ges Staff Training Institute (STI)- এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়, যা PATC নামে পরিচিত। ঢাকার অদূরে সাভারে PATC'র অবস্থান। এর প্রধান হলেন রেক্টর, যিনি একজন সচিব পদমর্যাদার সমতুল্য। PATC 'র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ ও মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান।

উপজেলা পরিষদ

৭ নভেম্বর, ১৯৮২ থেকে কার্যকর স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়। থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত (ক) সংরক্ষিত ও (খ) হস্তান্তরিত দুই বিষয়ে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয়কে হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে এবং তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রায় ২০ জন

প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করেন। কর আরোপ। করাসহ ব্যাপক উল্লয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৯২ সালের ২৬ জানুয়ারি উপজেলা বাতিল বিল পাস হয়। ১৯৯৬ সালে জাতীয় পাটির সমর্থনে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর সংসদে উপজেলা বিল পাস করে। এ বিল পাসের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে বাতিল করা উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার দেশের সকল প্রশাসনিক থানাকে 'উপজেলা' হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। সর্বশেষ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৩০ জুন ২০০৮ রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে তৃতীয় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম করে এবং ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়। চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালে।

নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সাংবিধানিকভাবে এটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। দেশের সকল নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কয়েকজন কমিশনার নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। নিয়োগকৃত কমিশনারদের কার্যমেয়াদ পাঁচ বছর। নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ অসদাচরণ কিংবা দায়িত্ব পালনে অসামর্থের কারণে দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন। তারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেও পদত্যাগ করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ দায়িত্ব পালনের পর অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তবে কমিশনের সদস্যগণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যাবলি

১. প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করা।
২. রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
৩. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ করা।
৪. সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা।
৫. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা লোগ। যেমন-
 - ক. রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্রের বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত বিতর্ক দেখা দিলে কমিশন উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
 - খ. কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচনের পর তার সদস্যপদের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরিত হয় এবং কমিশন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
 - গ. এসব দায়িত্ব ছাড়াও কমিশন সংবিধান অনুযায়ী আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করে থাকে।

নির্বাচনী আইন

নির্বাচনী আইন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে উল্লেখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর কিছু

কিছু ধারা সংশোধিত হয়ে বর্তমানে এই বিধিমালাগুলো যথাক্রমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০১৩, নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধনী) ২০০৮ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা ২০০৮ নামে পরিচিত। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইনবিধান গঠিত।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল

নির্বাচন চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পর্যবেক্ষক দলসমূহের তদারকির কারণেই নির্বাচন আরো সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে তাদের সরব উপস্থিতি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক দলসমূহ কাজ করে যায়। পর্যবেক্ষকগণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে দেশের সম্মান অটুট রাখে এবং নির্বাচনকে গতিশীল করতে প্রভূত সাহায্য করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ফলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ নির্বাচন আর নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সার্বিক প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি। মাধ্যম হচ্ছে পর্যবেক্ষক দলসমূহের কার্যক্রম। সামরিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তারা প্রায় সকলেই নিজেদের দেশপ্রেমিক ও নিরপেক্ষ হিসেবে জনগণের কাছে বিশ্বস্ত রাখতে চায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ সরকার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমনকি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন। নির্বাচনের প্রয়োজন হলে তারা অনেকে জয়লাভ করার জন্য কারচুপির আশ্রয় নেন ফলে নির্বাচন হয়ে ওঠে তামাশার। সবধরনের নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সার্বিক নির্বাচন প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের প্রয়োজনে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি বিভিন্ন দেশ, সংস্থা পর্যবেক্ষক দলসমূহ প্রেরণ করেন। তারা সরেজমিনে নির্বাচনের সার্বিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন সময়ে যেসব দেশ সংস্থা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন্স, জার্মানির পর্যবেক্ষক গ্রুপ, বিদেশি পর্যবেক্ষক মিশন, ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (VOTE), ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক টিম, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথ, মার্কিনভিত্তিক এনডিআই, এশিয়া ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্থানীয় অনেক NGO পর্যবেক্ষক দলসমূহের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, ওয়েভ, খান ফাউন্ডেশন, ফেমা, জানিপপ, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা The Representation of the Peoples Order (RPO) হলো একটি দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা। কোনো কোনো দেশে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আদেশ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এর কিছু কিছু ধারা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) বিল, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে আরপিও এর সংশোধন হয়। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য নির্বাচন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিধিমালা তথা জাতীয় সংসদে পাসকৃত পূর্ণাঙ্গ আইন থাকলেও জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখনো পূর্ণাঙ্গ আইন তথা এ্যাক্ট হয়নি। বরং ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেই দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন। তবে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ বা অধ্যাদেশও আইনের স্বীকৃত হওয়ায় এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে এটি অনুমোদিত হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশও যে আইন তা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। কয়েকবার এই আদেশটিকে এ্যাক্ট এ রূপান্তর করার চেষ্টা করা হলেও রাষ্ট্রপতির আদেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে এবং এর কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোরূপ সমস্যা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত নির্বাচনের এই আইনটি আদেশ নামেই বহাল রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) কি : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর ইংরেজি রূপ হলো দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার যা সংক্ষেপে আরপিও নামে পরিচিত। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি বাছাইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালাই হলো আরপিও। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি হওয়ায় এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিও নামে পরিচিত। আর যদি জাতীয় সংসদে এটি পাস হতো তাহলে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত পেত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই বিধিমালাটি আরপিএ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা এই আদেশনামাটি ১৯৭৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এদেশে যতগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটিতেই এটি আইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ যে ধারাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে মূল ধারাগুলোর বর্ণনা : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদেশের ৫ ধারা বলে নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সুষ্ঠু ও

নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক এলাকায় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত হয়েছে। ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যে কোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিসের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। আদেশের ১৭(১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে।

২৭(২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৮ ধারায় (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭(৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। ৩৯(১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। ৪৪(ক) ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিবেন। ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

আদেশের ৭৩ ধারায় ৪৪ (ক) ও ৪৪ (খ) এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহবান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোট প্রদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধাদান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। আরপিও এর ৮৪ ধারায় আরো উল্লেখ রয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ডে দণ্ডিত হবেন। ৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যে কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১(খ) ধারাবলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা নামে দুটি বিধিমালা প্রণয়ন করে।